Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী বিচারব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়মা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২১০৬৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী বিচারব্যবস্থা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়মা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২১০৬৮

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী বিচারব্যবস্থা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সায়মা আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২১০৬৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী বিচারব্যবস্থা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সায়মা আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২১০৬৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা 6

ইসলামী বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞা 7

ইসলামী বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 9

ইসলামী বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব 13

ইসলামী বিচারব্যবস্থার উপযোগী পরিবেশ 14

ইসলামী বিচারব্যবস্থার কাঠামো 14

১.জনবল কাঠামো (Manpower Structure): 16

২.ভৌত কাঠামো: 19

৩.বিচার বিভাগীয় কাঠামো (Jurisdictional Structure): 20

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় শাস্তির কঠোরতা ও সতর্কতা 24

ধর্ষণ 24

যিনা- ব্যাভিচার 28

মানবহত্যা 31

চুরি-ডাকাতি 36

ওয়ারিশের সম্পত্তি 40

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় ক্ষমতা 43

ইসলামে বিচারকদের বৈশিষ্ট্য 45

ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা 47

ইসলামী বিচারব্যবস্থার সৌন্দর্য্য 50

উপসংহার 53

ভূমিকা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের একমাত্র এবং একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য। সালাম ও দুরূদ বর্ষিত হোক খাতামুন্নাবিয়্যীন (خاتم النبيين) (সর্বশেষ নবী),রহমাতুল্লিল আলামীন (رحمة للعالمين) (বিশ্বজগতের রহমত),সাইয়েদুল মুরসালিন (سيد المرسلين)(রাসূলগণের সরদার) রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি,

لآ اِلَهَ اِلّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللهِ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (সত্য মাবুদ) নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক এবং রাসূলে পাক ﷺ আমাদের আদর্শ, আমরা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) আমাদের জন্য এমন যেনো দিশেহারা পথিকের জন্য কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্র।

রাসূল ﷺ,সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ,অনূকরনকারীদের উপর আল্লাহ শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। আমীন,ইয়া রব্বিল আ'লামীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلۡيَوۡمَ اَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِيۡنَكُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِىۡ وَرَضِيۡتُ لَكُمُ الۡاِسۡلَامَ دِيۡنًا‌ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।(সুতরাং এ দীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো)।"(আল মায়িদাহ- ৩)

কুরআন মাজিদে উল্লিখিত একেকটি শব্দ,বাক্য আমাদেরকে যেনো ভাবায়।ইসলাম কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ নয়।এটি হলো সর্বকালের সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়।ইসলাম একজন মুসলিমের সামাজিক, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় জীবনকেও সাজায় এবং প্রভাবিত করে।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٨٥

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবূল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আল ইমরান: ৮৫)

ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন(অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা)।অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা(গনতন্ত্র) আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য নয়।

ইসলাম এবং শরীয়তই মানবজীবনের সকল সমস্যার সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ সমাধান।তারই বিস্তারিত আলোচনা আমরা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক বিচারব্যবস্থা, যা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করে।

এটি নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এতে বিচারকগণ (কাজী) স্বাধীনভাবে রায় দেন। এর মূল লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ভাবে হরণ করা সম্পদ ও অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

"ইসলামী বিচারব্যবস্থা হচ্ছে শরীয়তের বিধিবিধানের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা এবং সাধারণ অধিকার রক্ষার সক্ষমতা।"[আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া: ৩/৩০৬]

এটি বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা করার এমন ব্যবস্থা যা ফয়সালাকৃত হুকুম পালনে বাধ্য করবে।এটি এমন ক্ষমতা যা মানুষের অধিকার রক্ষা এবং শরীয়তের আইন-কানুন আঁকড়ে ধরতে জনগনকে বাধ্য করবে।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞা

ইসলামিক বিচারব্যবস্থা হলো একটি রাষ্ট্র বা সমাজে কুরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে গঠিত আনুষ্ঠানিক ও কাঠামোগত ব্যবস্থা।

হানাফি ফিকহবিদ ইবনু আবেদীন শামী বলেছেন,

"কুরআন হাদীস থেকে আহরিত শারঈ বিধানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া,যাতে বিবাদের কারণ দূরীভূত হয় এবং বিতর্কের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়।" (হাশিয়াতু ইবনি আবেদীন মাআশ শরাহ : ৫/৩৫১)

এটি আদালত, বিচারপতি এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা, প্রয়োগ এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা করে।

ক. আভিধানিক অর্থ: আরবি ভাষায় বিচারের প্রতিশব্দ القضاء অর্থ বিবাদমান দু'পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া (Ibn Abidin 1386H.,5/351; Ihsan 1991,431-432)। কারো মতে, শব্দটির অর্থ মীমাংসা করা চাই তা বাচনিক হোক বা আচরিক হোক (Al-Isfahani 2005,406)। কেউ বলেছেন এর অর্থ ফয়সালা বা রায় প্রদান করা।একে "আল হুকুম"(الحكم) ও বলা হয় (Al-Nawawi 1392 H.,2/12)

খ. পারিভাষিক অর্থ:

১/ঈমাম জুহরি বলেন,"আইন কার্যকর করাকে বিচার বলে"।(Al-Nawawi 1392 H.,2/12)

২/আলাউদ্দিন আল কাসানী বলেন,"মানুষের মাঝে ন্যায়ানুগভাবে ফয়সালা করাকে বিচার বলে"(Al-Kasani 1986 7/2)

ইবনে আবেদীন বলেন, "বিচার দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফয়সালা করা" (Ibn Abidin 1386H 12/261)

৩/মুহাম্মদ ইবন আল ফারাজ বলেন,শরীয়াহর কোনো বিধানকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ আকারে প্রকাশ করাকে বিচার বলে।(Ibn Al Tullah 1987,21)

সুতরাং ইসলামী বিচারব্যবস্থা হলো বাদী-বিবাদীর দায়েরকৃত মামলার যথোপযুক্ত তদন্ত ও প্রমাণ সাপেক্ষে শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা করা এবং সর্বোপরি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

গ.সমন্বিত সংজ্ঞা: ব্যাপকার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও সুনির্ধারিত আলোকে গঠিত যে বিচারব্যবস্থা ইসলামী শারীয়াহ আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী বিচারব্যবস্থা (Islamic Judicial System)বলে।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ সর্বপ্রথম মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আইনের শাসন, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই একটি ইসলামী বিচারব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।
বিবাদ নিরসন ও বিতর্কের দরজা বন্ধ করা।এর জন্য আবশ্যককারী শক্তি, রাষ্ট্র থেকে পাওয়া ক্ষমতা এবং জনগণের আস্থা ও আনুগত্য প্রয়োজন।
এবং কুরআন সুন্নাহ তে থাকা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান বাস্তবায়ন।

- ইসলামী বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ২ টি:

১/আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং
২/ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

১.আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা : ইসলামী বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী।এ সম্পর্কে দলিল হলো:

ক.আল-কুরআন:আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" [আল মায়িদা :৪৪]

"যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই জালিম।"[আল মায়িদা:৪৫]

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই ফাসিক।" [আল মায়িদা: ৪৭]

"আর তুমি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক, তারা যেন আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত না করে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোন কোন

পাপের জন্য শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসেক।" [আল মায়িদা:৪৯]

"না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।" [আন নিসা: ৬৫]

খ.আস-সুন্নাহ :

১.উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা কাছের ও দূরের সকলের উপর আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দ কার্যকর করো। আল্লাহর কাজে কোনো সমালোচকের সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে।" (Ibn Majah ND,2540)

২.হজরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও অস্বীকার করে, তার গর্দান মারা বৈধ (হত্যাদণ্ড)। আর যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল, তার ওপর হদ্দ (শাস্তি) কার্যকর করার কোন পথ থাকে না। তবে সে হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে তা তার ওপর কার্যকর হবে।” (Ibn Majah ND,2539)

২/ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা:

ইসলামী বিচারব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

ক.আল-কুরআন:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করতে বসো, তখন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার করো। আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না সুন্দর উপদেশ দেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [নিসা:৫৮]

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা হুজুরাত:৯]

খ.হাদিস:

আল্লাহর রাসূল (সা.) আরও বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবেন অত্যাচারী শাসক।" (তিরমিজি)

আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করেন অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসেন, তবুও তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামী বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।আর-কুরআন এ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তবে কি তারা জাহেলী যুগের (অজ্ঞানতার) ফায়সালা কামনা করে? যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?"[আল মায়িদাহ:৫০]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব রচিত বা জাহেলী যুগের আইন-কানুনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে নিজেদের মনগড়া বা অন্য কোনো মানবীয় ফায়সালা খোঁজে, তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। মুমিন বা দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে একমাত্র আল্লাহর বিধানই সর্বোত্তম।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

"আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং ধৈর্য ধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফয়সালা করেন; আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী(বিধানকর্তা)।"[ইউনূস:১০৯]

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে (এবং তাঁর মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে) তিনটি প্রধান উপদেশ দিয়েছেন:

১. আল্লাহ প্রদত্ত ওহী বা বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

২. দ্বীনের পথে অবিচল থেকে ধৈর্য ধারণ করা।

৩. আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করা, কারণ তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

সুতরাং তার মনোনীত (ইসলামী) বিচারব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ বিচারব্যবস্থা।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার উপযোগী পরিবেশ

ইসলামী বিচারব্যবস্থা কার্যকর হবে শুধু দারুল ইসলামে(ইসলামী রাষ্ট্রে), দারুল হারব(অইসলামী রাষ্ট্রে) কার্যকর হবে না।

ক. যায়েদ ইবনে সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দারুল হারবে হুদুদ কায়েম করা হবে না।" (আল বায়হাকি ১৯৯৪,১৮০০৪)

খ. আইন প্রয়োগের ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের। এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা শুধু ইসলামী রাষ্ট্রই সংরক্ষণ করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বিদায় হজ্বে বলেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের রক্ত,ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরীয়তের হক ব্যতীত এমন পবিত্র করে দিয়েছেন যেমন পবিত্র তোমাদের এ মাসে,এ শহরে আজকের দিনটি।" তিনি আরো বলেন, "তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফরীর দিকে ফিরে যেও না।" (আল বুখারী ১৯৮৭,৬৪০৩)

যারা ইসলামী রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তাদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ আফসোস করেছেন এবং তাদের এ কাজকে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। দারুল ইসলামে বিচারব্যবস্থা নাগরিকের হাতে তুলে নেওয়া অবৈধ।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার কাঠামো

ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রধানত ৩ প্রকার। যথা: (১)জনবল কাঠামো,(২) ভৌত কাঠামো (৩) বিচার বিভাগীয় কাঠামো।

১.জনবল কাঠামো (Manpower Structure):

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচারকমণ্ডলী, আইন ও বিচারকার্য সহায়তাকারী সুনির্দিষ্ট বিভাগসমূহে দক্ষ জনবল নিয়োগ করবেন।

১.১.প্রধান বিচারপতি (chief Justice): রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিচারবিভাগেরও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে সংরক্ষণ করবেন।তবে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের বিচারবিভাগ পরিচালনার জন্য বিচারবিভাগীয় প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল ﷺ রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি প্রধান বিচারপতিও ছিলেন।কারন সুবিচার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: "অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে তারা আপনাকে বিচারক মেনে নেয়। এরপর আপনার দেওয়া ফায়সালার ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়।"(আন-নিসা:৬৫)

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করেছি; কাজেই তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন-বিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।"(সূরা সাদ:২৬)

১.২.হাকিম (Judge): সরকার বিচারব্যবস্থা ও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য হাকিম (বিচারক) নিয়োগ দিবে।

বিচারক নিয়োগের শারয়ী বিধান সম্পর্কে ফকীহ কাসানী রহ. বলেন, কাযী বা বিচারক নিয়োগ করা ফরজ। কেননা তিনি ফরজ কাজ সম্পাদনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন,আর তা হলো বিচারকার্য।(আল কাসানী ১৯৮৬,৭/২)।

বিচারকগণের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা বা বিচার করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক (ইনসাফের সাথে) ফয়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন!"(আন-নিসা:৫৮)

১.৩.পুলিশ(Police): সরকার বিচারকার্য পরিচালনার সময় আদালতের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সরকারি প্রহরী বা পুলিশ নিয়োগ করবেন।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, "কায়স ইবনে সা'দ রাসূল ﷺ এর সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ আমীরের(রাষ্ট্র প্রধানের)সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।"
যেহেতু বিচারক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও রায় দেন তাই তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
১.৪.সাহিবুল মাজলিস (Disciplinar of Mazlis): সরকার আদালতের বিশেষ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে "সাহিবুল মাজলিস" নিযুক্ত করবেন। বিচারকার্য চলাকালীন ইজলাসের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষা করা এই বাহিনীর কাজ।

১.৫.আমিন/পেশকার (presentationer): সরকার বিচার বিভাগের ক্রম সংরক্ষণকারী হিসেবে আমিন নিযুক্ত করবেন।
বিচারকের ইজলাসে বসার পূর্বে সে স্থানে ঐ আমানতদার ব্যক্তিকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।সে দেখবে কারা আগে এসেছে,যারা আগে এসেছে তাদের বিচারের ব্যবস্থা আগে করা হবে।(আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়াহ)
ইজলাসে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আমীন/পেশকারের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৬.বিশেষ প্রহরী (Special Security Guard): সরকার আদালতের ইজলাস সুরক্ষাকল্পে বিশেষ প্রহরী নিয়োগ করবেন।
বিচারক যদি মসজিদে অথবা নিজ গৃহে ইজলাস বসান, বিচারপ্রার্থীদের ভিড় ও বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য প্রধান ফটকে একজন বিশেষ প্রহরী থাকবে।সে কারো কাছ

থেকে প্রবেশের সময় কোনো প্রকার উৎকোচ গ্রহন করবে না।(আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়াহ.৩/৩২০)

১.৭.ওয়াকিল/উকিল (Advocate/barrister): মোকদ্দমার বাদী বিবাদীর বক্তব্যকে আদালতে উপস্থাপনের জন্য উকিল প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। সরকার বাদী মামলায় সরকারের পক্ষ থেকেও উকিল নিযুক্ত থাকেন।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَیۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنۡ لِّلۡخَآئِنِیۡنَ خَصِیۡمًا ۙ

١٠٥

"অবশ্যই আমি সত্য সহকারে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যেন তুমি যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর এবং খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ক করো না।"(০৪:১০৫)

১.৮.জুরী বোর্ড (Jury board): সরকার আদালতের বিচারকার্য সুষ্ঠু ও যথার্থভাবে পরিচালনার জন্য বিচারকের সুবিধার্থে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে একদল ফকীহ (ইসলামী আইনবিদ) নিয়ে জুরী বোর্ড নিয়োগ দিবেন।

১.৯.মুহতাসিব ও মোয়াবিন (Mohtasib & Assistants)::মুহতাসিব: সমাজ ও বাজারে নৈতিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন। .মোয়াবিন: বিচারকের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন এবং তথ্য-প্রমাণ যাচাইয়ে সহায়তা করেন।

*১.১০.সাক্ষী(Shuhud):*বিচারালয়ে বিশ্বস্ত সাক্ষীদের তালিকা বা 'দেওয়ানুল আদল' নামক সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকে। সাক্ষীর সততা যাচাই বা 'তাজকিয়া' অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ, এমন দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে।" (সূরা আত-তালাক, আয়াত ২)

২.ভৌত কাঠামো:

সরকার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আদালতের প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো বিনির্মাণ করবেন।

২.১.আদালত ভবন/দারুল কাযা(Court Building): সরকার বিচার বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আদালত ভবন নির্মাণ করবে। রাসূল ﷺ মদীনা মুনাওয়ারার প্রধান আদালতের সমস্ত কার্যক্রম মসজিদে নববীতে সম্পাদন করতেন।(আল-বায়হাকি ১৯৯৫,৬৭৪৭)

পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলে(৬২২-১৯২৪) আদালতের জন্য স্বতন্ত্র ভবন নির্মিত হয়েছে।

২.২.রেজিস্ট্রি বিভাগ(Registry Division): আদালতে দায়েরকৃত মামলার আরজী, শুনানি, সাক্ষ্য, প্রমাণ, জিজ্ঞাসাবাদ, তদন্তের রিপোর্ট, শাস্তির প্রকৃতিসহ যাবতীয় বিচারিক তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং ডিক্রি,দলিল ও রায়ের কাগজে সিলমোহর প্রদানে রেজিস্ট্রিবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কয়েদ করার সময় কাযী কয়েদির নাম, ঠিকানা ও বংশ পরিচয় নিবন্ধন করে রাখবেন।সেই সাথে কি কারনে তাকে বন্দী করা হলো,তার দেনার পরিমাণ কত,কয়েদ করার তারিখ সব নিবন্ধন করে রাখবেন।(আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ১৯৯১,৩/৪১৪-৪১৫)

২.৩.সীল-মহর বিভাগ(Seal Division): বিচার বিভাগের যাবতীয় কার্যকলাপের সত্যায়নের জন্য সিলমোহর বিভাগ প্রয়োজন।

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنهم হতে বর্ণিত “রাসূল ﷺ যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি পাঠানোর জন্য রূপার আংটি তৈরি করলেন যাতে লেখা ছিল(مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ)।”

২.৪.ইজলাস(The Courtroom): ইজলাস হলো আদালতে বিচারকের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র স্থান। মামলার শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণসহ যাবতীয়

বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিচারক আদালত বা সুবিধাজনক স্থানে ইজলাস বসাতে পারেন।
রাসূল ﷺ ইজলাস বসাতেন মসজিদে নববীতে।

২.৫.কাঠগড়া(Witness Box): আদালতে বিচারকার্য অনুষ্ঠানের সময় বাদী-বিবাদী যে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করে তাকে বর্তমান আদালতের ভাষায় কাঠগড়া বলে।
মসজিদে নববীতে মিম্বারে পাশেই বাদী-বিবাদী বক্তব্য দিতে।

২.৬.মহিলা বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার(Rest House of the Women Applicant to Justice): বাদী-বিবাদীর মহিলা আত্মীয়, মহিলা সাক্ষীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার থাকবে। 'মহিলা বিচারপ্রার্থী ও পুরুষ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার থাকবে। যদি মহিলাদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাদের পর্দার বিষয়টিও সংরক্ষিত থাকবে।(আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ১৯৯১,৩/৩২১)'

২.৭.কারাগার(Jail): কয়েদিদের জন্য নির্ধারিত সাজা ও আত্মসংশোধনকল্পে প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগের সহযোগী হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। সরকার কয়েদিদের জন্য সুন্দর,মনোরম ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের কারা ভবন নির্মাণ করবে। রাসূল ﷺ এর আমলে,খেলাফতকালে এবং পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলেও কারাগার ব্যবস্থাপনা ছিল।

৩.বিচার বিভাগীয় কাঠামো (Jurisdictional Structure):

ইসলামী রাষ্ট্রে একটি সুসংগঠিত বিচার বিভাগ থাকবে। মদীনা মুনাওয়ারা রাষ্ট্রের সফল রাষ্ট্রপতি রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় কাঠামো সকল ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ।

মদীনা মুনাওয়ারা রাষ্ট্রের প্রথম বিচার বিভাগীয় কাঠামো প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।যথা:(১) রাষ্ট্রীয় প্রধান আদালত,(২) প্রাদেশিক আদালত,(৩) আঞ্চলিক বা গোত্রীয় আদালত।

৩.১.রাষ্ট্রীয় প্রধান আদালত(Supreme Court of the State): ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় প্রধান আদালত থাকবে।এ আদালত কেন্দ্রীয় আদালতসহ রাষ্ট্রের সকল আদালত নিয়ন্ত্রণ করবে।এর মৌলিক ৫ টি বিভাগ থাকবে।যথা: (ক) উচ্চ আদালত (খ) আপীল বিভাগ (পুনর্বিবেচনা বিভাগ)(গ) বিশেষ আদালত (Special Tribunal) (ঘ) ভ্রাম্যমাণ আদালত(ঙ) দুর্নীতি দমন আদালত

(ক)উচ্চ আদালত(High Court)

রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান মামলাসমূহের বিচারের জন্য সরকার একটি উচ্চ আদালত গঠন করবে। মদীনা মুনাওয়ারা রাষ্ট্রের প্রধান আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্বয়ং রাসূল ﷺ।

(খ)আপীল বিভাগ(Appiled Division)

আপীল বিভাগ নিম্ন আদালতে বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে মামলার বাদী অথবা বিবাদীকে ন্যায় বিচার পাবার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণ:

কখনো কখনো মোকদ্দমার গুরুত্ব,ধরণ,আরজির উপর ভিত্তি করে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতে পাঠানো হয়।

দাউদ আ. এর শাসনামলে দুজন মা এসেছিলেন কোলের ছেলেটি কার তা মীমাংসার জন্য। দাউদ আ.(উচ্চ আদালত) ভুল মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন।ফলে তারা সুলাইমান

আঃ (নিম্ন আদালত) এর কাছে গেলে তিনি বিচক্ষণতার সাথে সঠিক ফয়সালা করে দিলেন।

এছাড়াও খন্দক যুদ্ধে বনু কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতার বিচার রাসূল ﷺ এর উচ্চ আদালতে না করে সা'দ বিন মুয়াজ রা. এর দায়িত্বে নিম্ন আদালতে প্রেরণ করেন।

(গ)বিশেষ আদালত (Special Tribunal)

রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার বিচারের জন্য সরকার এ আদালত গঠন করবে।

ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধে ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতার বিচার রাসূল ﷺ নিজে না করে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে এর ফয়সালা করেন।কারন বনু কুরায়জার রাসূল ﷺ এর কাছে আবদার ছিল তারা তাদের স্বগোত্রীয় সা'দ বিন মুয়াজ রা. এর ফয়সালা মেনে নিবে।বিশেষ আদালতের প্রধান নিযুক্ত করেন সা'দ বিন মুয়াজ রা. কে।

(ঘ)ভ্রাম্যমাণ আদালত(Mobile Court)

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রচলিত ছিল। ফৌজদারি ও দেওয়ানী উভয় আদালতের কার্যক্রম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে পারবে। রাসূল ﷺ বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

(ঙ)দুর্নীতি দমন আদালত(Court for Prevention of Corruption)

রাষ্ট্রে দূর্নীতি দমনে দূর্নীতি দমন আদালত আবশ্যক। মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে[ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে] ভেজাল ও দুর্নীতির বিচার করতেন।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একদা তিনি এক খাদ্যশস্যের স্তুপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়,তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং তা ভেজা অবস্থায় পেলেন। তিনি বললেন এ কি! বিক্রেতা বলল,'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে।'তিঁনি বললেন এগুলো উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা দেখে নিতে পারে? জেনে রেখ, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে,তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।(আত-তিরমিযী)

৩.২.প্রাদেশিক আদালত

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ হলে সরকার প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক আদালত গঠন করবে। সরকার প্রাদেশিক আদালত এবং অধঃস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ দিবে। মুয়ায ইবনে জাবাল রা. ইয়ামান প্রদেশের প্রশাসক ও বিচারক ছিলেন।

মদীনা রাষ্ট্র বৃহৎ পরিসরের হওয়ার রাসূল ﷺ প্রসাশনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মদীনা রাষ্ট্রকে ২৫ কি প্রদেশে বিভক্ত করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরগণ রাসূল ﷺ এর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তার একান্ত প্রতিনিধি। তাঁরা প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতা লাভ করেন।

৩.৩.নিম্ন আদালত/আঞ্চলিক বা গোত্রীয় আদালত(Court of Zonal and Community):

ইসলামী রাষ্ট্রে তৃণমূল পর্যন্ত নাগরিকদের মোকদ্দমা গ্রহণ ও বিচার ফয়সালার জন্য নিম্ন আদালত/আঞ্চলিক বা গোত্রীয় আদালত থাকবে,যেনো রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে।

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় শাস্তির কঠোরতা ও সতর্কতা

ইসলামে জুলুমকারীর কোনো স্থান নেই।ইসলাম কারো উপর জুলুম করে না এবং কাউকে জুলুম করার অবকাশও দেয়না।
এজন্যই অপরাধীর অপরাধ শনাক্তকরণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং শনাক্তকৃত অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয় যেনো সমাজে একই অপরাধ দ্বিতীয়বার সংঘটিত না হয়।

.অপরাধ সনাক্তকরণে সতর্কতা: ধর্ষণ, মদ্যপান,চুরি, হত্যাকাণ্ডসহ যেকোনো অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাক্ষী, প্রমাণ ও অপরাধীর স্বীকারোক্তি যাচাই-বাছাই করা হয় যেনো নির্দোষ কাউকে সাযা পেতে না হয়।
শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামে 'সন্দেহ হলে শাস্তি নয়, মুক্তি' নীতি অনুসরণ করা হয় এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে বা প্রতিহিংসামূলক কোনো শাস্তির বিধান নেই।
.শাস্তিতে কঠোরতা কেনো: সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং অপরাধীর কৃতকর্মের যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিফল নিশ্চিত করা। ক্ষতিগ্রস্ত বা ভুক্তভোগী ব্যক্তির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া বা তার উপর হওয়া অন্যায়ের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও প্রতিবিধান করা। অপরাধীর শাস্তি দেখে সাধারণ মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখে।

ধর্ষণ

বর্তমানে বিশ্বে ১৮ বছর বয়সের আগেই ৩৭ কোটি নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০২৬ সালের তথ্যমতে, ব্রাজিল, ফ্রান্স, মেক্সিকো, কলম্বিয়া এবং জার্মানির মতো দেশগুলোতে ধর্ষণের উচ্চ হার লক্ষ্য করা গেছে। গ্রেনাডা, যুক্তরাজ্য এবং সুইডেনও সর্বোচ্চ যৌন নিপীড়নের হারের তালিকায় রয়েছে।

১. আমেরিকা : কি ভাবছেন ভুল পরেছেন? না আপনি একেবারে ঠিক ই পরেছেন। পৃথিবীর এই সুপার পাওয়ার ধর্ষণ এর দিক থেকেও সুপার পাওয়ার। এখানে ধর্ষকদের ৯৯% ই পুরুষ। ভাবছেন এটা আবার কেমন কথা? বাকি ১% ধর্ষণ নারীদের মাধ্যমে হয়। U.S Bureau of Justice এর হিসেব মতে ধর্ষিতদের ৯১ শতাংশ নারী ও বাকি ৯ শতাংশ পুরুষ। National Violence Against Women Survey এর তথ্যমতে প্রতি ৬ জন নারীর একজন ও প্রতি ৩৩ জন পুরুষের একজন আমেরিকায় ধর্ষণ এর শিকার হয়। মাত্র ১৬% ধর্ষণ কেস রিপোর্ট করা হয় আমেরিকায়।

২/ভারত : ধর্ষণ এর হার যেন ভারতে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ভারতে নারীদের উপর নির্যাতনের মধ্যে সবচাইতে কমন হল ধর্ষণ। National Crime Records Bureau এর তথ্যমতে ২০১২ সালে ভারতে ২৪৯২৩ টি ধর্ষণ এর রিপোর্ট করা হয়েছে। তবে ভারতে ধর্ষণ হলে তার রিপোর্ট হয় একদম ই নগণ্য মাত্রায়। তবে আশাঙ্কা জনক বিষয় হল রিপোর্ট করা ধর্ষণ কেস এর ৯৮% নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে তার পিতা, নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী বা পরিচিতদের মাধ্যমে। কিছুদিন আগে তো চলন্ত বাসে গনধর্ষণ এর শিকার হল দামিনী। একদম নতুন তথ্যমতে ভারতে প্রতি ২২ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ হয়।

৩/যুক্তরাজ্য : যুক্তরাজ্য অনেক দেশের জন্য আদর্শ হিসেবে আছে বহু যুগ ধরে তাদের সভ্যতা, তাদের উন্নত প্রজুক্তির জন্য। কিন্তু এই যুক্তরাজ্য যে পৃথিবীর ৫ম মারাত্মক ধর্ষণপ্রবন দেশ এটা কজন ই বা জানে। ইংল্যান্ড ও ওয়ালেস এ প্রতিবছর প্রায় ৮৫০০০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়। এছাড়া ৪,০০,০০০ এর উপরে নারী প্রতিবছর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি ৫ জনে ১ জন নারী ১৬ বছরের পরে কোণ না কোণ ভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

৪/কানাডা: এপর্যন্ত কানাডাতে ধর্ষণ হয়েছে এমন রেকর্ড আছে ২,৫১,৬৯১৮ জনের। কানাডা তে যে পরিমান ধর্ষণ হয় তার মাত্র ৬% রেকর্ড হয়। কানাডার প্রতি তিনজন

নারীর একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। Justice Institute of British Columbia এর একটি রিপোর্ট মতে কানাডার প্রতি ১৭ জন নারীর একজন ধর্ষণ এর শিকার হয়।

৫/বাংলাদেশ: ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে ধর্ষণ মামলা বেড়েছে ২৭%।
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (ASK) তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০২৬-এ ৩৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১০টি দলবদ্ধ ধর্ষণ।২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল—মাত্র চার মাসে ৭৭৬ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

- **ধর্ষকদের গনতান্ত্রিক বিচার:**

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয় এবং ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন করে তোলে। National Research Council. Estimating the Incidence of Rape and Sexual Assault. Washington, DC: The National Academies Press, 2013 এর তথ্যমতে ২০১৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনা খুব কমই রিপোর্ট করা হয়।

.কম রিপোর্টিং

.প্রমাণের জটিলতা

.বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা

.পুলিশের উদাসীনতা

.ভিকটিম-ব্লেমিং বা দোষারোপ

.আইনের প্রয়োগে বৈষম্য: যুক্তরাষ্ট্রের Prison Rape Elimination Act (PREA) থাকা সত্ত্বেও, কারাগারের ভেতরে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার অনেকেই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন।

বাংলাদেশ ও ভারত: সকল গনতান্ত্রিক দেশের পিতা আমেরিকার মতোই এসব দেশগুলোতেও একই বিচারহীনতা ঘটে।কম রিপোর্টিং,প্রমাণের জটিলতা,বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা,পুলিশের উদাসীনতা,ভিকটিম-ব্লেমিং বা দোষারোপ,আইনের প্রয়োগে বৈষম্য ইত্যাদি নেক্কারজনক কার্যকলাপের মাধ্যমে ভিক্টিমকেই দমিয়ে দেওয়া হয়।

❖ **ইসলামী বিচারব্যবস্থায় ধর্ষকদের বিচার:** ইসলামে ধর্ষণকে শুধু ব্যভিচার (যিনা) হিসেবে নয়, বরং 'যিনা বিল জাবর' (জোরপূর্বক ব্যভিচার) বা 'মুহারাবা' (জনপদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি) হিসেবে গণ্য করা হয়।ধর্ষণের শাস্তি ও যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

বিবাহিত ধর্ষক: এর জন্য শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড। (আবূদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭২; মুওয়াত্তা মালেক হা/১৪, ২/৭৩৪; আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা ৫/২৬৮-৬৯; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৭/১৪৬)।

অবিবাহিত ধর্ষক: একশ' বেত্রাঘাতের সাথে মিছলে মোহর তথা উক্ত নারীর সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মোহর জরিমানা হিসাবে যুক্ত করেছেন। (আবূদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭২; মুওয়াত্তা মালেক হা/১৪, ২/৭৩৪; আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা ৫/২৬৮-৬৯; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৭/১৪৬)।

.'মুহারাবা' বা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা হিসেবে: যদি ধর্ষক অস্ত্রের মুখে, ভয়ভীতি দেখিয়ে বা দলবদ্ধভাবে (Gang Rape) ধর্ষণ করে, তবে একে 'মুহারাবা' বা 'ফাসাদ ফিল আরদ' (জমিনে ফিতনা-ফ্যাসাদ) হিসেবে গণ্য করা হয়। সেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, যার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জনপদে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি' (মায়েদাহ ৫/৩৩)।

সেক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আদালত উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করবে।নিম্নোক্ত শাস্তিগুলোর যেকোনো একটি দেওয়া যায়:মৃত্যুদণ্ড।শূলিতে চড়িয়ে হত্যা।বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়া।দেশান্তর বা নির্বাসন।

.নির্দোষ নির্যাতিতা: ধর্ষণের শিকার নারীর কোন শাস্তি হবে না (মিশকাত হা/৩৫৭২, সনদ ছহীহ)। তবে সে যে মূলত ধর্ষণের শিকার হয়েছে সে ব্যাপারে প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন চিৎকার করা, প্রশাসনকে অবহিত করা বা নিজেকে হেফাযতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টার ব্যাপারে কোন প্রমাণ থাকা।(বার্র,আল-ইস্তিযকার ৭/১৪আব্দিল৬)

কঠোর শাস্তির উদ্দেশ্য:

১. পবিত্রতা ও বংশধারা রক্ষা: ইসলাম মানবজাতির বংশধারা ও সম্ভ্রম রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

২. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: সমাজ থেকে 'ফাসাদ' বা বিশৃঙ্খলা দূর করে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন: কঠোর শাস্তির মাধ্যমে সমাজের অন্য অপরাধীদের ভয় দেখানো, যাতে ভবিষ্যতে এমন জঘন্য অপরাধ করার সাহস কেউ না করে।

৪. ব্যভিচারের চেয়ে গুরুতর: ধর্ষণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ এবং সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মতো অপরাধ থাকায়, এটি সাধারণ ব্যভিচারের চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

- **সারকথা:** ধর্ষণ একটি জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ।এটি প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে নারী ও শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামী বিচারব্যবস্থাই সর্বাধিক যথোপযুক্ত।

যিনা- ব্যাভিচার

- **গনতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা:** গনতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থায় সংবিধানে যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ থাকলেও শব্দের যথেষ্ট কারচুপির কারনে এই অপরাধের কোনো শাস্তিই হয় না এই দেশে।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি (Penal Code) অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪৯৭ ধারা অনুযায়ী এই বিধান কার্যকর করা হয়েছে।

- **এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:**

অপরাধী পক্ষ: অন্য কোনো ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রীর সাথে ওই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হয়। এতে কেবল পুরুষকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়।

নারীর দায়মুক্তি: এই আইনে কোনো নারীকে ব্যভিচারের জন্য শাস্তি দেওয়া হয় না বা তাকে অপরাধের সহযোগী (abettor) হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না।

মামলার অধিকার: শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত স্ত্রীর স্বামীই এই অপরাধের জন্য অভিযোগ দায়ের বা মামলা করতে পারবেন।

- **এই আইনের সমালোচনা ও দুর্বলতা:**

১/নারীটিকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবেনা, যদিও সে সমান অপরাধী ।

২/নারীটিকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে, অবিবাহিত হলে কারোই কোনো শাস্তি নেই।ফলে অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা বাড়ছে এবং উচ্চবিত্ত সমাজে 'সুগারড্যাডি'র মত কুরুচিপূর্ণ কালচার গড়ে ওঠার সাহস পাচ্ছে। বিবাহিত লোকটির সংসার ভাঙছে।

- **ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শাস্তি:**

.**বিবাহিত হলে:** ধর্ষক বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড (রজম) কার্যকর করার বিধান রয়েছে।

.**অবিবাহিত হলে:** ধর্ষক অবিবাহিত হলে তাকে প্রকাশ্যে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনে দেওয়ার বিধান রয়েছে।

(নূর ২৪/০২; বুখারী হা/৪৯৬৯; মুসলিম হা/১৬৯১; মিশকাত হা/৩৫৫৫)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর দ্বীন (বিধান) কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোনো দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"(সূরা আন-নূর, আয়াত ২)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,"আর ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কর্ম ও নিকৃষ্ট পথ।" (সুরা ইসরা, আয়াত: ৩২)

- **নববীযুগে ব্যভিচারের শাস্তির দৃষ্টান্ত:**

১. জুহাইনা গোত্রের নারীর ঘটনাজুহাইনা গোত্রের এক নারী ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়ে নবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং তার ওপর নির্ধারিত শরিয়তের হদ্দ (শাস্তি) প্রয়োগের অনুরোধ করেন। নবী (সা.) তার অভিভাবককে নির্দেশ দেন, সন্তান প্রসবের পর তাকে নিয়ে আসতে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি পুনরায় আসলে, নবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড (রজম) কার্যকর করা হয়। এই ঘটনাটি সাহাবি ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২. মায়েজ ইবন মালেক আসলামী (রা.)-এর ঘটনা:

মায়েজ ইবন মালেক (রা.) নামক এক সাহাবি নবী (সা.)-এর কাছে এসে চারবার নিজের ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেন এবং তাকে পবিত্র করার অনুরোধ জানান। নবী (সা.) প্রথমে তাকে ফিরে যেতে বললেও, তিনি বারবার নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করতে থাকেন। পরবর্তীতে তার মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে নবী (সা.) তাকে পাথর নিক্ষেপের (রজম) নির্দেশ দেন।

কত সুন্দর ইসলামী বিচারব্যবস্থা সুবহানাল্লাহ। অপরাধী হিসেবে নারী-পুরুষ কাউকেই ছাড় নেই। নারীটি গর্ভবতী ছিল বিধায় তার প্রতি সহমর্মিতা দেখানো হয়েছে।আর কিছু কাফেররা বলে ইসলাম হচ্ছে বর্বর!

- **সারকথা:** যিনা-ব্যভিচার সমাজে অশ্লীলতা ও অস্থিরতা ছড়ায়।এর কারনে পরকিয়ার সুযোগ হয়।তাই এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা উচিত। অথচ গনতান্ত্রিক কাঠামোতে এটিকে অপরাধ হিসেবেই নগন্য ধরা হয়। এদের কোনো শাস্তি হয়না। এক্ষেত্রে ইসলামী বিচারব্যবস্থাই যথোপযুক্ত।

মানবহত্যা

মানবহত্যা মহাপাপ ।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا.

"কেউ যদি হত্যা অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল।" —[সূরা মায়েদা (০৫) : ৩২]

কুরআন কারীম এ অপরাধের কঠিন বিচার ও শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। দুনিয়াতেও হত্যাকারীর জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, আর আখেরাতে তো আরো কঠিন, আরো ভয়াবহ শাস্তি রয়েছেই।

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় হত্যার বিচার মূলত 'কিসাস' (প্রতিশোধ বা হত্যার বদলে হত্যা) এবং 'দিয়ত' (রক্তপণ) এই দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এটি একটি কঠোর ও সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া, যা অপরাধের ধরন এবং নিহতের পরিবারের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

- **ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী হত্যার বিচারের মূল কাঠামো তুলে ধরা হলো:**

১. হত্যার শ্রেণিবিভাগ ও শাস্তি: ইসলামে হত্যার ধরন অনুযায়ী শাস্তির ভিন্নতা রয়েছে। প্রধানত তিন ধরনের হত্যার কথা বলা হয়েছে:

.ইমদ (পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত হত্যা): ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে খুন করার শাস্তি হলো 'কিসাস' বা মৃত্যুদণ্ড। তবে নিহতের পরিবার চাইলে কিসাসের পরিবর্তে ক্ষমা করে দিয়ে দিয়ত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে পারে।

.শাবহুল আমদ (আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যা): এমন অস্ত্র বা বস্তু দিয়ে আঘাত করা, যা সাধারণত মৃত্যু ঘটায় না, কিন্তু আঘাতের কারণে ব্যক্তি মারা যায়। এতে কিসাস নেই, তবে ভারী দিয়ত (রক্তপণ) প্রদান এবং কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) ওয়াজিব হয়।

.খাতা (অনিচ্ছাকৃত হত্যা): ভুলবশত বা দুর্ঘটনাজনিত হত্যা। এতে কোনো মৃত্যুদণ্ড বা কিসাস নেই। তবে এর জন্য হত্যাকারীকে কাফফারা আদায় করতে হবে এবং নিহতের পরিবারকে দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) দিতে হবে।

২. কিসাস (প্রতিশোধ):কিসাসের অর্থ হলো অপরাধী যেভাবে অপরাধ করেছে, তার সাথে ঠিক একই রকম আচরণ করা (অর্থাৎ কিসাস হল, জখমের বদলে অনুরূপ জখম এবং হত্যার বদলে হত্যা। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে কিসাসের বিধান হিসেবে এ অপরাধের বদলে তাকেও হত্যা করা হবে। এটি
কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট বিধান)।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلٰی اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰی بِالْاُنْثٰی.

হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস(-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী(-কেই হত্যা করা হবে)। —(সূরা বাকারা: ১৭৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালেম।" —(সূরা মায়েদা: ৪৫)

যদি কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বা খুনির স্বীকারোক্তি দ্বারা এবং বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হলে এবং নিহতের পরিবার কিসাস দাবি করলে তাকে রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার কোনো ব্যক্তিরই নেই।

- এটি শুধুমাত্র আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হলেই কার্যকর করা যায়, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ নেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

৩. ক্ষমার অধিকার ও দিয়ত (রক্তপণ): ইসলামী আইনে হত্যার বিচার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। নিহতের পরিবার বা ওয়ারিশদের একমাত্র অধিকার রয়েছে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার।পরিবার যদি ক্ষমা করে

দেয়, তবে হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পায় এবং তার পরিবর্তে নিহতের পরিবারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'দিয়ত' বা রক্তপণ প্রদান করতে হয়।

৪. সাক্ষ্য ও প্রমাণ: ইসলামী বিচারব্যবস্থায় নিরাপরাধ কাউকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রমাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।ইচ্ছাকৃত হত্যার বিচারের জন্য ন্যূনতম দুজন নির্ভরযোগ্য ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন।

নোট: হত্যাকারী যত প্রভাবশালীই হোক তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে-

ইসলাম ইনসাফ ও ন্যায়ের ধর্ম। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন সকল নাগরিকই ইসলামের চোখে সমান। পদ-পদবী, বংশ-মর্যাদা, বিত্ত বৈভব দ্বারা ইসলাম কাউকে বিচার করে না। অপরাধী যেই হোক অপরাধ প্রমাণিত হলে সাজা তাকে পেতেই হবে। হোক সে রাজা কিংবা প্রজা, ধনী বা গরিব, সমাজপতি বা সমাজচ্যুত। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিও যদি অতি সাধারণ কাউকে হত্যা করে, তবে তার থেকেও কিসাস নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপ্রধান বা সমাজের উচ্চমর্যাদাসীন হওয়ার কারণে কেউ ছাড় পাবে না।

আল কুরআন ঘোষণা দিয়েছে কিসাস হত্যাকারী থেকেই গ্রহণ করা হবে, অন্য কারো থেকে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى.

"হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস(-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী(-কেই হত্যা করা হবে)।" —[সূরা বাকারা (২) : ১৭৮]

৫. বিচারের প্রক্রিয়া: যেকোনো হত্যার বিচারের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ বা ক্রস-ম্যাচিংয়ের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করা বাধ্যতামূলক.অপরাধ প্রমাণিত হলে বিচারক রায় ঘোষণা করবেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা কার্যকর করা হবে।

বিচারের ক্ষেত্রে বিচারককে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে কোনো নির্দোষ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের শিকার না হন।

- **অপরাধ প্রমাণ হলে কিসাসই একমাত্র শাস্তি, অন্য কিছু নয়:**

কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে এবং নিহতের পরিবার কিসাস দাবি করে, তাহলে মুসলিম বিচারকের কর্তব্য— কুরআনের বিধান অনুযায়ী কিসাস কার্যকর

করা। এক্ষেত্রে অন্য কোনো শাস্তি যেমন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আমৃত্যু কারাদণ্ড ইত্যাদি শাস্তি প্রদানের কোনো এখতিয়ারই তার নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা কিসাসের বিধানকেই ফরয করেছেন।

কিসাসের বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালেম।" —[সূরা মায়েদা (০৫) : ৪৫]

তবে মনে রাখতে হবে, কুরআনের অন্যান্য বিধানের মতো কিসাসও কার্যকর করার অধিকার কেবল সরকারের। নিহতের আত্মীয়বর্গ বা অন্য কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে এসব বিধান কার্যকর করার অধিকার রাখে না। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্র সে রায় কার্যকর করবে।

- **কেবল নিহতের ওয়ারিসগণই কিসাস মাফ করতে পারে, অন্য কেউ নয়:**

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, অন্যায় হত্যার বদলে নিহতের ওয়ারিসগণ হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কুরআন নিহতের ওয়ারিসকে এ অধিকারও দিয়েছে, তারা চাইলে হত্যাকারী থেকে কিসাস না নিয়ে তাকে মাফ করে দেবে, আবার দিয়ত তথা আর্থিক সুবিধা নিয়েও মাফ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের ওলি)-এর পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) দাবি করার অধিকার (ওলির) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপর কেউ সীমালঙ্ঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত।" —[সূরা বাকারা (০২) : ১৭৮]

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে

দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালেম।" —[সূরা মায়েদা (০৫) : ৪৫]

ইসলামে কিসাস মাফ করার অধিকার রয়েছে কেবল নিহতের ওয়ারিসগণের। অন্য কারো নিজের পক্ষ থেকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার বা শাস্তি পরিবর্তন করার কোনো অধিকার নেই। কোনো রাষ্ট্রের আইনে যদি খুনিকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানকে দেওয়া থাকে আর সে ক্ষমতাবলে খুনিকে তিনি ক্ষমা করে দেন, তবে দেশীয় আইনে সে ক্ষমা পেয়ে গেলেও আল্লাহর আইনে সে ক্ষমা পাবে না।

আল কুরআন এ অধিকার তো কোনো রাষ্ট্রপতিকে দেয়নি। ইতিহাসে যেসকল সমাজে মানব রচিত আইনে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার কুফল ও অশুভ পরিণামও সে সমাজ দেখতে পেরেছে।

তবে কিসাস আইনে হত্যার বদলে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণ করার সুযোগ বা অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার ভুক্তভোগী পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

- **কিসাস অন্যায় রক্তপাত ও হত্যা রোধে রক্ষাকবচ:**

রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হল, নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কোনো রাষ্ট্রের আইন ও বিচারব্যবস্থা যদি নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সে আইনের সার্থকতা কোথায়? ইসলাম মানবজীবন রক্ষায় ও তার নিরাপত্তা বিধানে প্রণয়ন করেছে কিসাসের মতো ইনসাফপূর্ণ কঠিন বিধান। পাশাপাশি হত্যাকারীর জন্য রয়েছে পরকালে ভয়াবহ আযাবের ঘোষণা। কুরআনের বাণী শাশ্বত ও চিরন্তন। কুরআনের কিসাসের বিধান কোনো রাষ্ট্রে যথাযথভাবে কার্যকর হলে অন্যায় রক্তপাত, হানাহানি, খুন-খারাবী ও হত্যার মতো ভয়াবহ অপরাধ সমাজে বিস্তার লাভ করবে না। রাজনৈতিক প্রভাবে, ক্ষমতার দাপটে চাইলেই কেউ এ অপরাধ করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। সমাজ থেকে অবিচার ও জুলুম বহু গুণে হ্রাস পাবে। শত-সহস্র বছরের ইতিহাস এর জলজ্যান্ত সাক্ষ্য। ইতিহাসে যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ দমন করতে কিসাসের বিধান যতটা কার্যকরী হয়েছে, মানব রচিত কোনো আইন দ্বারা এমন সফলতা আসেনি। তাই কিসাসের বিধান হল মানবজীবন রক্ষার হাতিয়ার ও রক্ষাকবচ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"এবং হে বুদ্ধিমানেরা! তোমাদের জন্য কিসাসের ভেতর রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে।" —[সূরা বাকারা (২) : ১৭৯]

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিকল্প নেই। এখানে একজন সাধারণ নাগরিক থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির হক ও অধিকার সমান। হক ও অধিকারের ক্ষেত্রে সিআইপি বা ভিআইপি বলে আলাদা কোনো স্থান ইসলামে নেই। ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার সোনালি ইতিহাস দেখলে বিষয়টি কারো অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

.উদ্দেশ্য: ইসলামী বিচারব্যবস্থায় হত্যার বিচারের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং ভুক্তভোগী পরিবারের সুবিচার নিশ্চিত করা। অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা এবং প্রতিশোধের বর্বরোচিত প্রথা বন্ধ করে একটি শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা।

- **ইসলামী বিচারব্যবস্থার দৃষ্টান্ত:**

.সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা.)-এর ঘটনা: এক ব্যক্তি অন্য আরেকজনের নাক কেটে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কিসাস হিসেবে অপরাধীর নাক কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

.হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে জাবালার ঘটনা: গাসসান বংশের রাজা জাবালা বিন আইহাম কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময় এক সাধারণ বেদুইনের কাপড়ে তার পা লেগে যায়। এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওই বেদুইনের নাকে আঘাত করে। খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর কাছে বিচার দেওয়া হলে তিনি রাজাকে কিসাস (নাকের বদলে নাক কাটা) দেওয়ার নির্দেশ দেন।

চুরি-ডাকাতি

❖ গনতান্ত্রিক শাস্তি:

সাধারণ চুরির শাস্তি দণ্ডবিধির (Penal Code, 1860) ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

- **শাস্তি**

অপরাধের ধরন ও পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে চুরির শাস্তির ধারা এবং সাজার মেয়াদ ভিন্ন হয়ে থাকে:

সাধারণ চুরি (৩৭৯ ধারা): সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

আবাসন বা গুদামে চুরি (৩৮০ ধারা): কোনো মানুষের বসবাস বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানে চুরি করলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

কেরানি বা চাকর কর্তৃক চুরি (৩৮১ ধারা): মালিক বা নিয়োগকর্তার সম্পত্তিতে চুরি করলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

আঘাত বা মৃত্যু ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে চুরি (৩৮২ ধারা): চুরি করার সময় আঘাত, বলপ্রয়োগ বা মৃত্যুর ভয় দেখালে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

❖ ইসলামী বিচারব্যবস্থা:

কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে চুরি করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা এই নিকৃষ্ট কাজের নিন্দা করে বলেন, 'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।(সূরা আল-মায়িদাহ : ৩৮)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

''অনন্তর যে ব্যক্তি যুলুম তথা চুরি করার পর (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) তাওবা করে এবং নিজ আমলকে সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু''। (মায়িদাহ্ : ৩৮)

চুরির এই বিধান সকল প্রকার চুরির জন্য ব্যাপক নয়।

- **এ শাস্তি কার্যকর হওয়ার শর্ত:**

১.চুরির পরিমাণ অল্প হলে চোরের হাত কাটা যাবে না। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "এক দ্বীনারের চার ভাগের এক ভাগ (রুবু' দ্বীনার) এবং এর অধিক মূল্যের মাল চুরি ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।" (সহীহ মুসলিম)।

২.চোরের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অথবা গ্রহণযোগ্য যে কোনো দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে চৌর্যবৃত্তি প্রমাণিত হতে হবে।

৩.চোরা বস্তুটি যথাযোগ্য হিফাযতে থাকাবস্থায় চুরি হয়েছে ।

৪.বস্তুটি তার মালিকানাধীন হওয়ার ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ থাকবে না।

.চুরির পরিমাণ:হাদীছের মধ্যে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) বা ততধিক চুরি করলে তবেই হাত কাটা যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৪)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 'নবী (ﷺ)-এর যামানায় কোন চামড়া নির্মিত ঢাল (যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম) বা সাধারণ ঢালের সমান মূল্যের জিনিস চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা হত না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৯২,৬৭৯৩)।

- **শাস্তি :**

উপরে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে চোরের ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে, আবার চুরি করলে তার বাম পা, আবার চুরি করলে তার বাম হাত এবং আবার চুরি করলে তার ডান পা কেটে ফেলা হবে।

অন্যান্য:

১.জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

''আমানত আত্মসাৎকারী, লুটেরা এবং ছিনতাইকারীর হাতও কাটা হবে না''।

(আবূ দাউদ ৪৩৯১, ৪৩৯২, ৪৩৯৩; তিরমিযী ১৪৪৮; ইব্নু মাজাহ্ ২৬৪০, ২৬৪১; ইব্নু হিববান ১৫০২ নাসায়ী ৮/৮৮; আহমাদ ৩/৩৮০)

২.রা'ফি' বিন্ খাদীজ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ.

“কেউ কারোর ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলে অথবা কারোর খেজুর গাছের মাথি-মজ্জা খেয়ে ফেললে তার হাতও কাটা হবে না”।

(আবূ দাউদ ৪৩৮৮; তিরমিযী ১৪৪৯; ইব্নু মাজাহ্ ২৬৪২, ২৬৪৩; ইব্নু হিববান ১৫০৫ নাসায়ী ৮/৮৮; আহমাদ ৩/৪৬৩)

৩.আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আমর বিন্ ‘আস্ব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গাছের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “কেউ প্রয়োজনের খাতিরে সাথে কিছু না নিয়ে (কারোর কোন ফলগাছের ফল) শুধু খেলে তাকে এর জরিমানা স্বরূপ কিছুই দিতে হবে না। আর যে শুধু খায়নি বরং সাথে কিছু নিয়ে গেলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যে ফল শুকানোর জায়গা থেকে চুরি করলো এবং তা ছিলো একটি ঢালের সমমূল্য তখন তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে। আর যে এর কম চুরি করলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে”।

(আবূ দাউদ ৪৩৯০; ইব্নু মাজাহ্ ২৬৪৫ নাসায়ী ৮/৮৫; হা’কিম ৪/৩৮০)

চুরি বা ব্যভিচারের মত ধ্বংসাত্মক পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামী শরী‘আহ অনুযায়ী মুসলিম শাসকের নির্দেশে কার্যকর করতে হবে। কিন্তু ইসলামী শাসকের অনুমতি ব্যতীত কোন পাপের শাস্তি স্বরূপ কাউকে হত্যা করা বা কারোর হাত কাটা নিষিদ্ধ।

সঊদী স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি সহ অন্যান্য আলেম বলেন, ‘হাদ্দ (মৃত্যুদণ্ড, সাজা, শাস্তি) প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি মুসলিম ইমাম, সুলতান, শাসক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধির উপর নির্ভরশীল। মুসলিম শাসক ও তাঁর প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য ‘হাদ্দ’ ক্বায়েম করা অনুমোদিত নয়। কোন মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজের জন্য হাদ্দ ক্বায়েম করা জায়েয নয়। কারণ এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, অস্থিরতা, অরাজকতা, নৈরাজ্য ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা সমাজের নেই (ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমাহ, ২২/৫-১০; মাজমূঊ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৯/৩০৩ পৃ.; লিক্বাউল বাব আল-মাফতূহ্, লিক্বা নং-৩১)।

যেহেতু আমাদের দেশে ইসলামী শাসক নেই তাই ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে হাদ্দ (মৃত্যুদণ্ড, সাজা, শাস্তি) প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে গুনাহগার ব্যক্তি দুনিয়াবী তুচ্ছ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেলেও কিন্তু পরকালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

তাই পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট কঠোরভাবে তাওবাহ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে।

- **চুরির শাস্তির দৃষ্টান্ত:**

১/'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

"জনৈকা মাখ্জূমী মহিলা মানুষ থেকে আসবাবপত্র ধার নিয়ে তা অস্বীকার করতো তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত খানা কাটতে আদেশ করলেন"।

(মুসলিম ১৬৮৮; আবূ দাউদ ৪৩৭৪, ৪৩৯৫, ৪৩৯৬, ৪৩৯৭)

২/স্বাফ্ওয়ান বিন্ উমাইয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

"আমি একদা মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিলো ত্রিশ দিরহামের। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি এসে চাদরটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিলো। লোকটিকে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত খানা কেটে ফেলতে বলেন"।

(আবূ দাউদ ৪৩৯৪; ইব্নু মাজাহ্ ২৬৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯; আহমাদ ৬/৪৬৬; হা'কিম ৪/৩৮০ ইব্নুল জারূদ্, হাদীস ৮২৮)

কেউ শয়তানের ধোঁকায় চুরি করে ফেললে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে চুরিত বস্তুটি উহার মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। চাই সে তা প্রকাশ্যে দিক অথবা অপ্রকাশ্যে। সরাসরি দিক অথবা কোন মাধ্যম ধরে। যদি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উহার মালিক বা তার ওয়ারিশকে পাওয়া না যায় তা হলে সে যেন বস্তুটি অথবা বস্তুটির সমপরিমাণ টাকা মালিকের নামে সাদাকা করে দেয়। যার সাওয়াব মালিকই পাবে। সে নয়।(মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী)

ওয়ারিশের সম্পত্তি

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল।তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য- যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে আর যদি সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, তাদের কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর এবং তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সিকি অংশ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ- তোমাদের কৃত ওয়াসীয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতাহীন ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর শুধু বৈপিত্রেয় একটি ভাই বা একটি ভগ্নি থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছ' ভাগের এক ভাগ। যদি তারা তার চেয়ে অধিক হয়, তবে সকলেই তৃতীয়াংশে শরীক হবে কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়, এ হল আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য।আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরবাসী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে।" - (সূরা নিসা: ১১-১৪)

"লোকেরা তোমার কাছে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করছে; বল, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে ফাতাওয়া দিচ্ছেন, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার যদি সন্তান না থাকে আর তার একটি বোন থাকে, তবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক সে পাবে, আর সে (মৃত নারী) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দু' বোন থাকলে তারা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দু'-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি ভাই ও বোন দু'ই থাকে, তবে পুরুষ পাবে দু'জন নারীর সমান। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে তোমরা বিভ্রান্তিতে পতিত না হও। আল্লাহ যাবতীয় ব্যাপারে পূর্ণরূপে অবহিত।" - (সূরা নিসা : ১৭৬)

শরীয়তে বান্দার হকের গুরুত্ব:

ইসলামে বান্দার হক বা মানুষের অধিকার অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। বান্দার হক বিনষ্টকারীর পাপ আল্লাহ নিজে থেকে ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ক্ষমা করে।

.আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর তোমরা মানুষের জিনিসপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।" (সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ১৮৩)।

"নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করছে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

আস-সুন্নাহ:

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা ইলম (জ্ঞান) শিক্ষা কর এবং তা মানুষের মাঝে শিক্ষা দাও... এমনকি ফরায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা কর এবং তা মানুষকে শেখাও। কেননা, এটি মানুষের মাঝে খুব দ্রুত ভুলে যাওয়া হবে।"

"হাদিসে মৃতের হক বা ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে যথাযথভাবে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

- **শাস্তি:**

১/ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ:

কোনো ব্যক্তি তার ভাই-বোন বা অন্য ওয়ারিশদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করলে বা জোরপূর্বক দখল করে রাখলে, খিলাফতের আদালত বা বিচারক (কাজি) সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন। বিচারক ওই ব্যক্তির দায়িত্বহীনতা বা অন্যায় প্রমাণিত হলে বেআইনিভাবে দখলকৃত সম্পত্তি তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সঠিক ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

২/কঠোর তিরস্কার ও সামাজিক বয়কট (তা'জির):

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী, বিচারক বা খলিফা অপরাধীর অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে তাকে 'তা'জির' বা সাধারণ দণ্ড দিতেন। এর মধ্যে অপরাধীকে জনসম্মুখে তিরস্কার করা, বেত্রাঘাত করা, কিংবা সামাজিকভাবে বয়কট করার মতো নজিরও ছিল।

- ❖ **গনতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা:**

এ সিস্টেমে বছরের পর বছর মামলার কোনো রায় হয় না।কারন দেওয়ানি আদালতের দীর্ঘসূত্রতা, যেখানে রায় পেতে ১৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত লেগে যায়।

বাংলাদেশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় যাবত যে মামলাগুলো অসমাপ্ত থাকে তার প্রথমেই পাওয়া যাবে জমি-জমা এবং সম্পত্তিবন্টন বিষয়ক মামলাগুলো !

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় ক্ষমতা

অনেকেই ভাবেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। হ্যাঁ,ইসলাম নিঃসন্দেহে শান্তির ধর্ম। তাই তাদের এই ভাবনায় কোনো ভুল নেই।তবে তাদের ভুলটা হলো,তারা একে এতই শান্তির ভাবে যে,সমাজে গতানুগতিক ধারার অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম চললেও ইসলাম একটু শক্ত করে প্রতিবাদও করতে আসবে না। তাদের এই ধারণাটাই ভুল।

পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী অপরাধের প্রতিবাদ ইসলাম এমনভাবে করে যেনো সকলের জন্য তা দৃষ্টান্ত ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। এবং বিচারব্যবস্থা এমনই হওয়া উচিত।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা,যাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা সবকিছুই বিদ্যমান।

ইসলামে ক্ষমতা আমানত এবং বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত একটা ভারী দায়িত্ব। ইসলামে ক্ষমতা দেওয়া হয় সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে।আর যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

তাকওয়াবান ব্যক্তি কখনো সেধে সেধে ক্ষমতা নেয় না(খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ইসলামী সালতানাতের ইতিহাস থেকে আমরা সে শিক্ষাই পাই)। কারন এ দায়িত্ব অনেক কঠিন আর এর মধ্যে অসৎকারীদের আখিরাতে বিচারও কঠিন।

ইসলামে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাকওয়াবান ব্যক্তিত্বদের। কারন তাঁরা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী চলেন।আর আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাজের আদেশ দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۚ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ‏

“হে মুমিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।”(মায়িদাহ:০৮)

ইসলামে বিচারকদের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম কখনোই মানুষকে শুধু ক্ষমতা দিয়ে রাঘব বোয়াল হওয়ার সুযোগ দেয়না। ইসলাম মানুষকে ক্ষমতা দেওয়ার পাশাপাশি অনেক বাধ্যবাধকতা দিয়ে দেয় যেনো তাঁরা নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন।

ইসলাম শুধু ক্ষমতা দেয়না।সবার আগে তাকওয়া,নৈতিকতা, মানবতার শিক্ষা দেয় তারপর ক্ষমতা দেয়।ফলে আদিষ্ট ব্যক্তি চাইলেই কোনো অন্যায় করতে পারে না। কেননা তার ভয় থাকে, মনুষ্যত্ব থাকে।

وَلَا تَقۡرَبُوۡا مَالَ الۡيَتِيۡمِ اِلَّا بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ حَتّٰى يَبۡلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوۡفُوۡا الۡكَيۡلَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ۚ وَاِذَا قُلۡتُمۡ فَاعۡدِلُوۡا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبٰى ۚ وَبِعَهۡدِ اللّٰهِ اَوۡفُوۡا ؕ ذٰ لِكُمۡ وَصّٰكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ ۙ

"(ইয়াতীমরা) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইয়াতীমদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ কর, আমি কোন ব্যক্তির উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না, যখন কথা বলবে তখন ইনসাফপূর্ণ কথা বলবে- নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে হলেও, আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ কর। এসব ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"(আল আনআম:১৫২)

- **সত্য সাক্ষ্য প্রদানে আপস না করা:**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوۡ عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰهُ اَوۡلٰى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰٓى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا ۚ وَاِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতারূপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। ৯৫ সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরীব হয়, তবে আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের ব্যাপারে (তোমাদের চেয়ে) বেশি কল্যাণকামী। সুতরাং তোমরা ইনসাফ করার ব্যাপারে ইচ্ছা-অভিরুচির অনুসরণ করো না। ৯৬ তোমরা যদি পেঁচাও (অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।"(সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

- **আদেশ, ইনসাফ ও সদাচরণের ভিত্তি:**

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَیَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ وَالۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"(আন-নাহল: ৯০)

- **আমানত রক্ষা ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ:**

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا ۙ وَاِذَا حَکَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡکُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ نِعِمَّا یَعِظُکُمۡ بِہٖ ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতগুলো তার হকদারের নিকট পৌঁছে দেবে! আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা বা বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- **শত্রুর সাথেও ইনসাফ বজায় রাখা:**

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا کُوۡنُوۡا قَوّٰمِیۡنَ لِلّٰہِ شُہَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۫ وَلَا یَجۡرِمَنَّکُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰۤی اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۟ ہُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰی ۫ وَاتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো।এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।"(সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৮)

- **আল্লাহ তায়ালা বিন্দু পরিমাণ জুলুম বা অন্যায় করেন না:**

إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيما"؛ [قرآن: نساء

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার বা অন্যায় করেন না [তাঁর প্রতিটি কাজ ন্যায়ভিত্তিক] এবং যদি কেউ [ওই অণু পরিমাণ] সৎ কাজ করে তাহলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন।" [নিসা:৪০]

- **আল্লাহ্ তায়ালার সকল কাজ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত:**

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"؛ [قرآن: آل عمران[١٨ ،

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও (এই একই বিষয়ে) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, [আল্লাহর সকল কাজ] ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই।" [আলে-ইমরান:১৮]

ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

- ঢাকার মিরপুরে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী শিশু রামিসা আক্তারকে ধষর্ণ ও হত্যার ঘটনা-১৯ মে,২০২৬।
- ময়মনসিংহে রাবেয়া কে বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ধর্ষণ - ২৬ মে,২০২৬।
- সাভার ভবানীপুরে কামরুল হাসানকে ছাত্রীর সাথে অনৈতিক কাজ করার মিথ্যা অপবাদে মারধর করে-২৫ মে,২০২৬।

নিউজ পেপার, নিউজ চ্যানেল চারদিকে শুধু খুন-ধর্ষন-ছিনতাই-অপবাদ-মারামারি ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই, স্থিরতা নেই। সবদিকে সবখানেই শুধু ভয় আর অনিশ্চয়তা।
কারন আমরা আমাদের ফিতরাত(নিজস্বতা) পেছনে ফেলে আসতে চাই যা সম্ভব তো হয় ই নি,উল্টো দুর্ভোগ বেড়েছে।

যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ভালো বোঝেন এবং জানেন তার সৃষ্টির জন্য কোনটা অনুকূল, তার সৃষ্টির সিস্টেমটা কোন পরিবেশে সবচেয়ে ভালো আউটপুট দিবে। অথচ আমরা পরিবেশের(সমাজ, রাষ্ট্রের)কনসেপ্ট নেই বিধর্মী এবং পথভ্রষ্ট মানুষের কাছ থেকে।
ইসলাম হচ্ছে মানুষের ফিতরাতি ধর্ম (আমি ব্যক্তিগতভাবে একে ধর্ম বলাটা অপছন্দ করি যদিও, তবু বোঝার সহজতার জন্য বললাম। কারন এটা আসলে একটা দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা)। জন্মগতভাবেই প্রতিটি মানুষ মুসলিম।এটাই মানুষের ফিতরাত(নিজস্বতা)। আল্লাহ তাআলা বলেন,
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহর দেওয়া ফিতরাত (স্বভাবধর্ম)-এর অনুসরণ কর, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" (আর-রূম: ৩০)

"প্রতিটি নবজাতকই 'ফিতরাত' (ইসলামী স্বভাবধর্ম)-এর ওপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক রূপে গড়ে তোলে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)।
সুতরাং ইসলামের মাঝেই মানবজাতির রয়েছে মুক্তি ও কল্যাণ।

- ‘এনলাইটমেন্টের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে,যা নিছক তাত্ত্বিক নয়, বাস্তবায়ন যোগ্যও।

ইউরোপিয়ানরা ছিল পোপতান্ত্রিক।ধর্ম নিয়ে ইউরোপের মতো মুসলিমদের অভিজ্ঞতা এক নয়।
(জাহিলিয়াতের আরবে ইসলাম এনেছিলো সভ্যতা ও শৃঙ্খলা আর ইউরোপীয়রা ধর্মের নামে পেয়েছে চরম অসভ্যতা ও বিশৃঙ্খলা)
রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে ইউরোপ শিকল খুলে ফেলেছে আর আমরা খুলে ফেলেছি সোনার হার। রাষ্ট্র থেকে চার্চকে সরিয়ে ইউরোপ মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে ফেলেছে আর সেই অনুকরণে আমরা মাথা থেকে নামিয়েছি মুকুট।’(বই:অবাধ্যতার ইতিহাস)

- ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে। তাই চিন্তা-চেতনায় রাষ্ট্রে-পরিবারের সবকিছুতে ইসলামকে ধারণ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
“তবে কি তোমরা কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের) কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে? তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।”(বাকারা:৮৫)

ইসলামে দুনিয়া এবং আখিরাত ভিন্ন নয়, বরং একই সূত্রে বাঁধা।দুনিয়া হচ্ছে শস্য ক্ষেত্র এবং আখিরাত হচ্ছে ফলাফলের জায়গা।সুতরাং দুনিয়া এমন ভাবে অতিবাহিত করতে হবে যেন আখেরাতের ফল ভালো হয়।

আমাদের এই সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামী বিচারব্যবস্থাই দিতে পারে, ইসলামই দিতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে মানুষ তা বুঝতে শুরু করেছে। দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হতে,জীবন জীবিকার নিশ্চয়তায় ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার সৌন্দর্য্য

- **শাসকের বিরুদ্ধে নাগরিকের নালিশ:**

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় শাসকের নিজের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের নালিশের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হলো,

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে তাঁরই বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিক উবাই ইবনে কাবের দায়ের করা একটি মামলা।

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ও সাহাবি উবাই ইবনে কাবের মধ্যে একটি বাগান বা খেজুর গাছের মালিকানা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়।

কোনো মীমাংসা না হওয়ায় উবাই ইবনে কাব খলিফা ওমরের বিরুদ্ধে মদিনার বিচারক (কাজি) যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর আদালতে নালিশ দায়ের করেন।

বিচারক যায়েদ ইবনে সাবেত নালিশ গ্রহণ করে খলিফাকে আদালতে হাজির হওয়ার সমন পাঠান। খলিফা ওমর (রাঃ) একজন সাধারণ নাগরিকের মতো আদালতের কাঠগড়ায় হাজির হন।

আদালতে আসার পর বিচারক খলিফাকে সম্মান দেখিয়ে নিজের বসার আসন ছেড়ে দিতে উদ্যত

হলে খলিফা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাদী-বিবাদীর মাঝখানে সাধারণ কাতারে বসেন। অভিযোগের প্রমাণ না থাকায় উবাই ইবনে কাবের কাছে খলিফা শপথ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন বিচারক অন্য কোনো প্রমাণ না পেয়ে উবাই ইবনে কাবের পক্ষে রায় দেন এবং খলিফা তা হাসিমুখে মেনে নেন।

- **নিজের ছেলেকেও ছাড় না দেওয়া:**

উমর (রা.)-এর ছেলে আব্দুর রহমান (আবূ শাহমা) মিশরের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তিনি অসাবধানতাবশত এমন এক 'নাবীয' (খেজুরের শরবত) পান করেন, যাতে মাদকতা চলে এসেছিল।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি নিজেই মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে গিয়ে শাস্তির দাবি জানান।

আমর ইবনুল আস (রা.) খলিফার ছেলের সম্মানের কথা বিবেচনা করে তাকে রাজপ্রাসাদের ভেতরে (জনসম্মুখে নয়) শরিয়ত নির্ধারিত বেত্রাঘাত করেন।

উমর (রা.) এই খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ হন। তিনি আমর (রা.)-কে চিঠি লিখে তিরস্কার করেন যে, খলিফার ছেলেকে কেন সাধারণ নাগরিকদের মতো জনসমক্ষে শাস্তি দেওয়া হলো না। পরবর্তীতে মদিনায় এনে তাকে পুনরায় সাধারণ নিয়মে শাস্তি দেওয়া হয়।

- **দেশের বাহিরের আগন্তুককে সম্মান করা,বুঝিয়ে বলা:**

আমিরুল মুমিনীন উমর (রা:) এর সময়ে মসজিদে নববীতে ২ জন তায়েফ এর লোক এসে উচ্চ স্বরে কথা বলছিল। উমর (রা:) বললেন তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এরপর শুনলেন তোমরা কোথাকার অধিবাসী। তারা জানালো আমরা তায়েফের। তখন তিনি তাদের বললেন তোমরা মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলার অপরাধে তোমাদের আমি শাস্তি দিতাম। কিন্তু যেহেতু তোমরা মদীনার মেহমান, তাই কিছু বললাম না।

মসজিদের আদব হলো মসজিদে কেবল আল্লাহ তায়ালার কথা হবে। মসজিদ হলো বিনয় প্রদর্শন এর স্থান। রাজার রাজার(আল্লাহর) সামনে মাথা অবনত করার জায়গা। তার অনেক রাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সবর করেছেন এবং তাদের সুযোগ দিয়েছেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী বিচারব্যবস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন,সমৃদ্ধ,সফল,সুসংগঠিত, সুসংহত,সুশৃঙ্খল, প্রথম লিখিত, প্রামাণ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা।আল কুরআন আস সুন্নাহ ও ইজতিহাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক মৌলিক কাঠামো হলো: জনবল কাঠামো, ভৌত কাঠামো ও বিচার বিভাগীয় কাঠামো। ইসলামী বিচারব্যবস্থার পূর্বে ও পরবর্তীতে পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রে অনুরূপ কোনো পূর্নাঙ্গ এবং সফল বিচারব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইসলামী বিচারব্যবস্থা ছিল ৬২২- ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ বছর পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডের নন্দিত বিচারব্যবস্থা।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার বিচার বিভাগীয় কাঠামোর গঠন ও বিন্যাস ন্যায়বিচারের জন্য অধিক উপযোগী।

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত গনতন্ত্রের ধ্বজাধারী না হয়ে ইসলামী বিচারব্যবস্থা নিয়ে জ্ঞানার্জন করা। একে কাফির মুশরিকদের শেখানো মৌলবাদী, কঠোর, জঙ্গি বিচারব্যবস্থা না বলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং তুলনা করে বোঝার চেষ্টা করা ইসলামী বিচারব্যবস্থা হারিয়ে আমরা কি হারিয়েছি আর কি পেয়েছি!

মানবপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক দাবী তার মাঝেই ইসলামী বিচারব্যবস্থার আপাত কঠোর শাস্তি নীতির প্রাসঙ্গিকতা নিহিত। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার চরম উন্নতির যুগে তুমুল উৎসাহের সাথে হরহামেশাই প্রচারিত হচ্ছে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কি রকম বর্বর তার প্রকাশ্য কিংবা আকার-ইঙ্গিতের বিবরণ। যারা কিছুটা সংযমী তারাও আল্লাহর আইনকে কেবল মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার জন্য উপযোগী ছিল বলে পান্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করে নিজেদেরকে আধুনিক জাহির করেন। অথচ কেতাদুরস্ত বিতর্কের বাইরে বাস্তবতায় এসে উপরোক্ত ঘটনায় এই তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃত্রিমতার খোলস ঠেলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা বাস্তবতার আলোয় একাকার হয়েছেন। একই সাথে ইসলামের কঠোর বিচারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও অবচেতনভাবে উচ্চকিত করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ এখন মানুষ বুঝতে পারছে ইসলামী বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।তাই আমাদের উচিত ইসলামী বিচারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা এবং আরো

বিস্তৃতভাবে জানা। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশ এবং জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামী বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

"আর তুমি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক, তারা যেন আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত না করে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসেক।" [আল মায়িদা:৪৯]

আল্লাহ তায়ালার হুকুমাত ই হুকুমাত আর বাকি সব জাহিলিয়াত।

যার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমরা বর্তমানে দেখতে পারি।